ভয় শুধু ভয়

(ভয়ের গল্প সংকলন)

সম্পাদনা

কল্যাণ সরকার

সূচিপত্র

শেফালি অন দ্য রক্স	কৌশিক সামন্ত	১১
অনুপমের মা	আকাশ গুহ	১৬
সব কাহিনি কাল্পনিক নয়	শান্তনু দাস	৩৮
নশ্বরদহন	কর্ণ শীল	৬৭
প্রতিশোধ	মঞ্জুলিকা রায়	৯৪
দিনের রং কালো	রাখি আঢ্য	১০৯
গহিন অরণ্যে	অমিতাভ সাহা	১২০
অশরীরী রিরংসা	বাণীব্রত গোস্বামী	১৩৬
অভিশপ্ত ইতিহাস	সুদীপ্ত ঘোষ	১৫২
প্রদীপ	মনীষ মুখোপাধ্যায়	১৫৭
নিভেভোর সন্ধানে	তমোঘ্ন নস্কর	১৭২
পাপ	পুষ্পার্ঘ্য দাস	১৮৬
দোলনা	শাশ্বতী মুন্সী	২০৩
ব্রাউন সাহেবের বাড়ি	অভিষেক সরকার	২২০
গিরগিটি	কল্যাণ সরকার	২৩৪

সম্পাদকীয়

ভয়ের গল্প পড়তে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ হয়তো বাঙালি পাঠকমহলে প্রায় নেই বললেই চলে। আর এর প্রধান কারণটাই হল এইসব গল্পের দুর্নিবার আকর্ষণী ক্ষমতা, যা মানুষকে সব সময় সম্মোহিত করে রাখে। আসলে আমরা যারা ভয়ের গল্প পড়ি, বা পড়তে ভালোবাসি, তারা খুব ভালোভাবেই জানি, কতটা মারাত্মক টান থাকে এই গল্পগুলোর মধ্যে। এমনকি আমার তো এ-ও মনে হয় যে, এগুলো রীতিমতো একটা নেশার মতো কাজ করে আমাদের মন-মস্তিষ্কে। যেটা আমরা অনুভব করি এবং উপভোগও করি।

এই যেমন ধরুন, আমরা জানি যে ভয়ের গল্প পড়লে আমাদের গা ছমছম করবে, ফাঁকা বাড়িতে সন্ধের পর নিজের থেকেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠবে, কিংবা অন্ধকারে হেঁটে যাওয়ার সময় মনে হবে, পিছন পিছন কেউ আসছে। কিন্তু তারপরেও সব জেনেশুনে আমরা এই গল্প পড়ার লোভ সংবরণ করতে পারি না। ভয়ের কোনো বই হাতে পাওয়ামাত্রই, নিজেদের নাওয়া-খাওয়া ভুলে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে দিই সেটা। কেন করি এরকম?

তার কারণ হল এই নেশা। আসলে আমরা ভয় পেতে ভালোবাসি। শরীরের শিরশিরানি একটা রোমাঞ্চের অনুভূতি দেয় আমাদের। আর যুগযুগান্ত ধরে মানুষ যে সব সময় রোমাঞ্চের খোঁজ করে চলেছে... এ কথা কে না জানে?

যা-ই হোক, বইবন্ধু পাবলিশার্স-এর পক্ষ থেকে যখন আমার কাছে এই বইটি সম্পাদনা করার প্রস্তাব আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে মনে বেশ উত্তেজিত হই আমি। তার কারণ হল... প্রথমত, বইটির বিষয়বস্তু আমার অত্যন্ত পছন্দের, অর্থাৎ কিনা 'ভয়'। আর দ্বিতীয় কারণ হল, বইটি সম্পাদনা করতে গেলে এই বইয়ের সব গল্প আমাকে খুব খুঁটিয়ে পড়ে দেখতে হবে... আর স্বাভাবিকভাবেই

সেটা হবে এই বই বেরোনোর অনেক আগেই। এবার আপনারাই বলুন, একটা নতুন প্রকাশিতব্য ভয়ের বই, যার মধ্যে এতগুলো হাড়-হিম-করা গল্প আছে, সেগুলো সবার আগে পড়তে পারাটা কি কম সৌভাগ্যের কথা? তাহলে আমি হলাম কিনা সৌভাগ্যবান!

যাক, এবার আসি আসল কথায়... যেটা বলার জন্য এতগুলো কথার উত্থাপন করলাম। 'ভয় শুধু ভয়' নামক এই বইতে ছোটোগল্প, বড়োগল্প আর উপন্যাস নিয়ে মোট পনেরোটা কাহিনি আছে। কিন্তু তার মধ্যে চোদ্দোটা কাহিনি এমন আছে, যেগুলো পড়ার পর, সত্যি বলছি, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি আমি! আর শুধু স্তম্ভিত বলাটাও হয়তো ভুলই হবে... এর মধ্যে এমন কিছু গল্প আছে, যেগুলো পড়তে গিয়ে আমি রীতিমতো ভয়ে শিউরে উঠেছি, আবার কিছু গল্প এমনও আছে, যেগুলো পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তার আবেশ থেকে গেছে বহুক্ষণ। আসলে এককথায় বলতে গেলে, ভয়ের গল্পকে যে এতটা আলাদা আলাদা আঙ্গিকে লেখা যায়, তা হয়তো এই বই সম্পাদনা না করলে আমি জানতেও পারতাম না। তাই স্বীকার করতে দ্বিধা নেই... এই বইয়ের সম্পাদক হতে পেরে আমি গর্বিত।

আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সেই সমস্ত সহলেখক-লেখিকাকে, যাঁদের কলম থেকে সৃষ্ট এহেন মণিমুক্তার দ্বারা এত সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে উঠেছে 'ভয় শুধু ভয়'। আপনাদের লেখনী দীর্ঘজীবী হোক, করুণাময় ঈশ্বরের কাছে এই কামনাই করি।

পরিশেষে আমার প্রিয় পাঠক-বন্ধুদের উদ্দেশে বলি... আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি, এমন একটা বই আপনাদের সম্মুখে উপহার দিতে, যেটা পড়ার পর আপনাদেরও মনে হবে... অনেকদিন পর বেশ কিছু ভালো গল্প পড়লাম। এবার আমার এই প্রচেষ্টা কতটা সফল হল বা ব্যর্থ হল, তা আপনারাই আমাকে জানাবেন। আমি আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

ও হ্যাঁ, আরও একটা কথা.... এই বইয়ের সমস্ত খ্যাতি, সকল গৌরব, সব সফলতার দাবিদার থাকবেন আমার সেইসব প্রিয় লেখক-লেখিকা, যাঁরা নিজেদের অসংখ্য ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সময় বের করে এই বইয়ের জন্য কলম ধরেছিলেন... আর এই বইয়ের যা কিছু ভুলত্রুটি, যা কিছু খারাপ, যে-কোনো

ব্যর্থতার দায়ভার থাকবে আমার অর্থাৎ এই বইয়ের সম্পাদকের উপর। তাই ভালো লাগুক বা খারাপ, নিশ্চিন্তে জানাবেন এই বইয়ের পাঠ-প্রতিক্রিয়া। কথা দিলাম, একটি কথা না বলে, নতমস্তকে নিজের সব ভুল স্বীকার করে নেব, এবং অবশ্যই চেষ্টা করব পরের বার এই ভুলভ্রান্তিগুলো সংশোধন করার।

তাহলে আর কী, আজ না হয় এইটুকুই থাক। পরের গল্পগুলো তোলা রইল 'ভয় শুধু ভয়'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য। তখনই না হয় বলা যাবে বাকি কথাগুলো।

ওহো, দেখেছেন তো, গল্প করতে করতে আসল কথাটা বলতে একদম ভুলেই যাচ্ছিলাম। যাক, এইবেলা না হয় বলেই ফেলি সেটা। এই বইয়ের যে পনেরো নম্বর গল্পটা আছে, সেটা আমার একদমই ভালো লাগেনি... তবু একপ্রকার বাধ্য হয়েই নিতে হয়েছে গল্পটাকে, তাই একটু চিন্তাতেও আছি।

আচ্ছা, আপনাদের কেমন লাগল, একটু জানাবেন তো আমায়।

ব্যাস, তবে আর কী...

আমার কথাটি ফুরাল

নটেগাছটি মুড়াল...

ভালো থাকবেন সকলে... সুস্থ থাকবেন... আর অতি অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের পাশে থাকবেন।

ধন্যবাদান্তে...

—কল্যাণ সরকার

শেফালি অন দ্য রক্‌স

কৌশিক সামন্ত

এক

ঘোলাটে নীল একটা আলো, চাপা সুরের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল স্কোর, দামি পারফিউমের গন্ধ ছাপিয়ে ভেসে-আসা কোনো এভারগ্রিন ককটেল। সত্যি বলতে কী, এই পরিবেশ আমি খুব পছন্দ করি, আমার খুব ভালো লাগে। তাই প্রায় প্রতিদিনই অফিস-ফেরত পথে কোনো না কোনো বার-এ আমি ঢুঁ মেরে থাকি।

প্রতিরাতে সুস্বাদু কিছু লোভনীয় ডিশ, আর একটা সফ্‌ট ড্রিংক, এই থাকে আমার মেনু।

নাহ্‌, বারের পরিবেশ আমার খুব পছন্দ হলেও, আমি কিন্তু মদ খাই না, মদ আমার পেটে খুব একটা সহ্য হয় না।

আমার বাবা অবশ্য খুব মদ খেতেন। অ্যালকোহলে দিবারাত্রি ডুবে থাকতেন। বাকিরা বারণ করলেও শুনতেন না। কী যেন একটা দুঃখ ছিল বাবার মধ্যে। আমাকে দেখলে যেন সেটা আরও বেড়ে যেত। আমি মানুষ হয়েছি আমার দাদু-দিদার কাছে। মাসে একবার বাবা এসে খরচ দিয়ে যেতেন। ব্যাস ওইটুকুই, এর বেশি বাবার সঙ্গে আমার ইনটার‍্যাকশন হত না। বাবা তাঁর নিজের বাড়িতে একলাই থাকতেন। নিজের সন্তানের প্রতি কারও দৃষ্টিতে এত ঘৃণা থাকে, সেটা আমার বাবাকে না দেখলে বোঝা যেত না।

প্রথমে আমি সবটা না বুঝলেও, পরে যখন বড়ো হই, জ্ঞান হয়, দিদার কাছ থেকে সবটা জানতে পারি। আমার মা খুব ধর্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন। দু-বেলা ঠাকুরকে জল-বাতাসা না দিয়ে তিনি কিছু মুখে কাটতেন না। বাবা-মায়ের অ্যারেঞ্জ্‌ড ম্যারেজ হয়েছিল। তাই বাকি অ্যারেঞ্জ্‌ড ম্যারেজে যা হয়, প্রথমটা একটু রাফ হলেও পরে দুজনে দুজনকে খুব ভালোবেসে ফেলেন।

আমি হওয়ার আগে মায়ের দুবার মিসক্যারেজ হয়েছিল। সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল, ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। হাল ছাড়েননি শুধু মা। যে ঠাকুর তাঁর সব কথা শুনত, সে কেন এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে আছে? মা এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। দিনরাত মা ঠাকুরঘরে পড়ে থাকতেন, মন্দির-মসজিদে ঘুরে বেড়াতন, কাঁদতেন, হত্যে দিতেন। হেন কোনো জায়গা নেই মা যাননি। হেন কোনো সাধু-পির ছিল না, মা যার পা ধরেননি। পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন মা, বাবার শত বোঝানোতেও তাঁকে আর ফেরানো যায়নি। পাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করেন তিনি।

এরকম একটা অস্থির সময়ে আমি আসি মায়ের পেটে। ডাক্তারবাবুরা বলেন মিরাক্‌ল, মা বলেন ঈশ্বরের দান। কিন্তু বাবা মেনে নিতে পারেননি। বাবার বক্তব্য ছিল, এটা ইমপসিব্‌ল। তিনি যেখানে মায়ের কাছে পর্যন্ত যাননি, সেখানে সন্তান আসবে কীভাবে? বাবা মা-কে সন্দেহ করতে শুরু করেন। মা-র হাজার মিনতিতেও বাবার মন গলে না। তিনি বলেন এ সন্তান তাঁর নয়। এ সন্তানের পিতা তিনি কিছুতেই হতে পারেন না। তবে মুখে এ কথা বললেও, বাবা কিন্তু তখনও মা-কে ছেড়ে যাননি।

শেষ অবধি আমি পৃথিবীতে আসি। আর তারপরেই সবটা বদলে যায়। মা-কে অবশ্য বাবার ঘৃণা বেশিক্ষণ সহ্য করতে হয়নি, তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন। সবটা গিয়ে পড়ে আমার উপর। বিস্ময়, ভয়, ঘৃণা—সবটাই আমার উপর উজাড় করে দেন তিনি। যা-ই হোক, বাবা আমাকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলতে পারেননি, দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু নিজের কাছে বেশি দিন রাখতে পারেননি। সেই থেকেই আমি দাদু-দিদার কাছে থাকি।

আজকে কেন জানি না, বারবার পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। এই

অনুপমের মা

আকাশ গুহ

"এ কী বউমা! মাংসটা ধুলে না?"

শাশুড়ির আওয়াজ পেয়ে চমকে ওঠে অরুণা, তারপর এক ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে শাশুড়ির দিকে তাকায়, পিছনে সরে আসেন রাধারানি।

যেন গিলে খেয়ে ফেলবে শাশুড়িকে। ভস্ম করে দেওয়া কুটিল দৃষ্টি চোখে। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও সেই চুল খুলে পশ্চিমের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে এই রাত্রিবেলায় কাঁচা মাংস নিয়ে বসেছে অরুণা।

খানিকক্ষণ ওভাবেই বিরক্তি এবং ঘৃণা ভরে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে অরুণা, তারপর একটা সম্পূর্ণ অচেনা ঘষা গলায় বলে ওঠে, "খাসির মাংস অত ধুতি নেই, ওতে গন্ধ চলি যায়।"

ভিতর অব্দি কেঁপে ওঠে রাধারানির, এ গলা তিনি নতুন শুনছেন না, আগেও শুনেছেন বহুবার। এ অরুণার গলা নয়। মহাদেব এবং গ্রামের সকলেই বলে, ওর নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই সারাদিন ভুলভাল বকে, অস্বাভাবিক কাজকর্ম করে। কিন্তু রাধারানি ভালো করে জানেন ব্যাপার অন্য। তা ছাড়া সেদিন সাব্বির মিয়াঁ তো বলেই গেলেন...

বুকের বাঁদিকটা অসম্ভব তীব্র একটা চাপ অনুভব করলেন রাধারানি, তবুও কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "তা-ই বলে তুমি রক্ত-মাখা মাংসগুলোকে কড়াইতে চাপাবে? এসব কি খাওয়াদাওয়া! তুমি ছাড়ো বউমা, ঘরে যাও, আমায় করতে দাও।"

"না না না! তোকে দেব না।" দাঁতে দাঁত ঘষে প্রায় গর্জন করে ওঠে অরুণা, "রাক্ষসী বুড়ি! তুই একা সব খেয়ে নিবি, আমি খাব মাংস। আমি খাব! তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাব, এই দেখ।"

বলতে বলতেই চোখের নিমেষে একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়ে বসে অরুণা, খাবলা ভরে গামলায় রাখা কাঁচা খাসির মাংস তুলে নেয়, তারপর মুখে ভরে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খানিকটা চিবোয়।

বিকৃত গলায় হাসতে হাসতে বলে ওঠে, "কী রে বুড়ি! আর খাবি মাংস? দেখ, আমি খাচ্ছি, তোকে খেতে দেব না। দেখ, এই দেখ!"

রাধারানির বুকের ব্যথাটা হঠাৎ করে চারগুণ বেড়ে ওঠে, এ মানুষ নয়, এ কিছুতেই মানুষ হতে পারে না। মানুষ এভাবে কাঁচা মাংস খেতে পারে না। সাব্বির মিয়াঁ ঠিকই বলেছেন।

"মহাদেব, মহাদেব! শিগগির আয় বাবা... তোর বউ..."

মুখটা বাঁদিকে বেঁকে যায় রাধারানির, সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখেন হঠাৎ করেই। কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ করে অত বড়ো শরীরটা নিয়ে মেঝের উপর পড়ে গেলেন রাধারানি। স্নায়ু চাপমুক্ত হল, আর উঠলেন না কোনোদিন।

ডাক্তার এসে নাড়ি দেখে মৃত ঘোষণা করে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। অরুণাকে কে সন্দেহ করবে? সবাই জানে ওর মাথা খারাপ, তা ছাড়া ন-মাসের পোয়াতি সে, রাধারানির ডাক্তার বহু আগেই বলে দিয়েছিলেন, যে-কোনো সময় স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে, রক্তে প্রচুর হাই প্রেশার।

রাধারানির এই স্ট্রোকটা বহুদিন আগেই হয়ে যেত, তবে আজকের ঘটনা সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, এর আগেও রাধারানি অরুণার এমন সব ভয়ংকর কাণ্ড নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কারও কাছে কিছু প্রমাণ করতে পারেননি। ব্যাপারটা প্রথম খেয়াল করেন যখন অরুণা দু-মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

ততদিনে অবশ্য ভুলভাল বকতে শুরু করেছে নতুন বউমা। এ নিয়ে দুঃখের শেষ ছিলনা রাধারানির। শিকারপুরের বল্লভপাড়ার সবচেয়ে বড়ো বাড়িটা মহাদেব কীর্তনীয়াদের। ওর বাবা গোপালচন্দ্র কীর্তনীয়া ছিলেন এ তল্লাটের সবচেয়ে বড়ো

চালের আড়তদার, এখন সে ব্যাবসা একমাত্র ছেলে মহাদেব দেখছে। অঘোষিত জমিদারই বলা চলে কীর্তনীয়াদের। আর সে বাড়ির একমাত্র পুত্রবধূ নাকি এমন বদ্ধ উন্মাদ!

তবে বিয়ের আগে ঠিকই ছিল, বাচ্চাটা পেটে আসার পর থেকেই মাথাটা খারাপ হতে শুরু করেছে অরুণার। এক বছর হয়েছে, ওদের বিয়ে হয়েছে, আগে কখনও বউমার এমন আচরণ দেখেননি রাধারানি, বিয়ের আগে তো নয়ই, তাহলে এই মেয়েকে তিনি ঘরে তুলতেন নাকি? গরিব ঘরের মেয়ে অরুণা, রূপ আহামরি কিছু না হলেও গুণে ভারী লক্ষ্মী ছিল মেয়েটা। অনেক দেখেশুনেই এই মেয়েকে গৃহবধূ করে ঘরে এনেছিলেন রাধারানি, কিন্তু এ কী, তার সোনার সাজানো সংসারের উপর কার যে বিষদৃষ্টি পড়ল! বেশ কিছু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর রাধারানি বুঝতে পারলেন অরুণার এই আচার-আচরণগুলো স্রেফ পাগলামি নয়, এর পিছনে আছে অন্য কিছু। এমন কিছু, যা হয়তো যুক্তি দিয়ে বিচার করা চলে না।

একেবারে প্রথমদিকের ঘটনা, দোতালায় পুত্র-পুত্রবধূর ঘর, তিনতলায় ঠাকুরঘর। দোতলা পেরিয়ে এক সন্ধেয় ঠাকুরঘরে বাতি দিতে যাচ্ছিলেন রাধারানি, অরুণার ঘরের দরজা হাঁ করে খোলা। মহাদেব বাড়ি নেই। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরোতেই রাধারানি শুনতে পেলেন নারীকণ্ঠে রক্ত-জল-করা একটা বিশ্রী অট্টহাসি। অরুণা হাসছে। কী ব্যাপার দেখার জন্য তাড়াতাড়ি করে এসে দরজায় দাঁড়ালেন রাধারানি।

উঁকি না দিলেই ভালো করতেন বোধহয়, ভিতরের দৃশ্যটা একদম সহ্য হল না তাঁর।

যে বউকে তিনি কখনও ঘোমটা ছাড়া দেখেননি, সেই অরুণা চুল খুলে ভরসন্ধেবেলায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত-পা বেঁকিয়ে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে, দুই পা এবং দুই হাতের উপর ভর দিয়ে দেহটাকে হুকের মতো বাঁকিয়ে দিয়েছে সে, রোজ যোগব্যায়ামের অভ্যাস না থাকলে বা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এ ধরনের অঙ্গভঙ্গি প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া অরুণার শরীর যথেষ্ট ভারী, ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সে, চোখ সামনের দেওয়ালের দিকে।

সব কাহিনি কাল্পনিক নয়

শান্তনু দাস

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ গভীর রাত :

রাতের ঘন অন্ধকারে গোটা বাড়িটা যেন জেগে উঠেছে, ঠিক যেন কোনো পিশাচের মতো গিলে খেতে আসছে তাকে। অনীতা পাগলের মতো দৌড়োচ্ছে। এ বাড়ির প্রত্যেক আনাচকানাচে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য অতৃপ্ত অশরীরী। তারা সকলে তাকে ধাওয়া করেছে। চুন-খসা কালো ইট বার-হওয়া প্রতিটা দেওয়ালের খাঁজ থেকে যেন কয়েকটা বীভৎস অবয়ব তার দিকেই তাকিয়ে আছে। পুরো বাড়িটা যেন একটা পরিত্যক্ত কবরস্থান, ঠিক হয়নি, এখানে আসা একদম ঠিক হয়নি—এ কথা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে অনীতা।

মোবাইলে টর্চ জ্বেলে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে কোনোমতে উপরে উঠেছে সে। প্রতি পদক্ষেপে মনে হচ্ছিল যেন পিছন পিছন কারা দৌড়ে আসছে। তাদের অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ ধীরে ধীরে আরও তীব্র হচ্ছে তার কানে। যে-কোনো মুহূর্তে মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যাবে, আলো নিবে যাবে, আর তারপর... অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুকিয়ে-থাকা অসংখ্য কায়াহীন সত্তা গ্রাস করবে তাকে, যেমন করে তার বাকি তিনজন বন্ধুকে করেছে, ওরাই যে জাগিয়ে তুলেছে তাদের।

ওদের আওয়াজও এখন বেশ স্পষ্ট শুনতে পারছে সে, তারা বলছে, "উই হ্যাভ ইয়োর বেবি, উই হ্যাভ ইয়োর বেবি।"

অনীতা প্রাণের বাজি রেখে দৌড়োচ্ছে। এই তো এই করিডরটা পার করলেই

দরজা, অন্ধকারে যদিও ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। এই ঘন অন্ধকারের সমুদ্রে, মোবাইলের টর্চের আলো যতটুকু ছড়িয়ে পড়েছে, তার গোলাকার বৃত্তের বাইরে যেন সারে সারে মৃত্যুলোকের বাসিন্দারা তার অপেক্ষায়। তাদের আবছা অবয়ব দেখতে পাচ্ছে অনীতা। কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ দেওয়াল বেয়ে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে, আজ রাতের তাদের শেষ অতিথিকে তারা ছেড়ে দিতে চায় না। কোনোমতে দরজাটার কাছে পৌঁছোল অনীতা, কিন্তু এ কী! দরজা তো বন্ধ। সে পাগলের মতো দরজার কড়া ধরে নাড়তে লাগল, "দরজা খোলো, দরজাটা খোলো, প্লিজ কেউ দরজাটা খুলে দাও। লেট মি আউট প্লিজ।"

পিছনে অনেকগুলো গলার ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে আসছে, ধীরে ধীরে কাছে, আরও কাছে।

শেষ সম্বল হিসাবে অনীতা সেই পরম অবলম্বনকেই আঁকড়ে ধরল, যাঁকে চরম বিপদের সময় প্রায় প্রতিটি মানুষই স্মরণ করে। যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক-না কেন, তাঁর সন্তানদের বিশ্বাস, তিনি আছেন, তিনি নিজের সন্তানদের সমস্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। তিনি আছেন তাঁর সন্তানদের বিশ্বাসে, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। সন্তান বিপদে পড়লে তিনি তো আর ঘুমিয়ে থাকতে পারেন না।

অনীতা নিজের মনের সমস্ত বিশ্বাস একত্রিত করে ডাকল, "প্লিজ গড, প্লিজ লেট মি আউট।"

দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল, অনীতা ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাড়িটার উঠোনে কিছু দূরে যাবার পর চরম ক্লান্তিতে একটা ছোটো পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। আর উঠে দাঁড়ানোর মতো শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই শরীরে। খোলা আকাশের নীচে, মাটির উপর শুয়ে হাঁপাতে লাগল অনীতা, মোবাইলটা অন অবস্থায় হাতের পাশেই পড়ে আছে। মাথার উপর অনন্ত বিস্তৃত তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত শ্রান্তি অনুভব করল সে। একটু পরে হাতের চেটোয় ভর দিয়ে অর্ধেক উঠে বসল সে। সামনে দোতলা বাড়িটা যেন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকেই। পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতেই লোহার বড়ো গেটটা চোখে পড়ল অনীতার, এই মৃত্যুপুরীতে ঢোকবার ও বেরোবার

ফটক।

কয়েক ঘণ্টা আগে ওরা চারজন মিলে এই গেট দিয়েই তো ঢুকেছিল এই নরকে, কিন্তু বাইরে যাবে একা সে। নিজের অজান্তেই চোখে জল চলে এল অনীতার, হাতে-পায়ে জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত শরীর ও মন নিয়ে উঠে দাঁড়াল অনীতা, হাতে তুলে নিল মোবাইলটা, স্ক্রিনটা স্ক্র্যাচ হয়েছে, টর্চটা তখনও জ্বলছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে এই অভিশপ্ত জায়গাটা থেকে বেরোতে হবে, গেটের দিকে এগোল অনীতা।

ঠিক তখন উঠোনের শুকনো ঝরাপাতার গায়ে খসখস শব্দ তুলে একটা ঠান্ডা বাতাস অনীতার কানের কাছে যেন ফিশফিশিয়ে বলে গেল, "মেরি, উই হ্যাভ ইয়োর বেবি।"

মোবাইলটা সুইচ অফ হয়ে গেল, ঘুরে দাঁড়াল অনীতা ওরফে অ্যানি, ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ বাড়িটার দিকে। কর্কশ গলায় বলে উঠল সে, "আই অ্যাম কামিং টু গেট মাই বেবি।"

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সন্ধ্যা:

"বস, এবারের ভ্লগের জন্য যে আইডিয়াটা মাথায় এসেছে না—জাস্ট কাঁপিয়ে দেবে।"

অ্যানি অত্যন্ত নিরুৎসাহিত ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ, আগের বারেও তুই তা-ই বলেছিলি।"

"আরে, এক-দুটো আইডিয়া মিসফায়ার করতেই পারে, সেই ধরে বসে থাকলে চলে? এবারে যা কনসেপ্ট আছে না, পুরো ফেটে যাবে।"

শুভম এবার ঋকের আরেক দফা লেগ পুলিং করার জন্য বলল, "এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই ঋক যে এবারও ফেটে যাবে। কিন্তু প্রশ্নটা হল কার? চ্যানেলের ভিউয়ারদের, না আমাদের?"

ঋক কেমন যেন একটা ধিক্কারের ভঙ্গিতে তাকাল শুভমের দিকে। তারপর প্রচণ্ড সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলতে লাগল, "এইজন্য, ঠিক এইজন্য বাঙালি উন্নতি করতে পারে না, জানিস। বাঙালি কোনো কিছু করতে গেলে সবচেয়ে আগে বাঙালিই তার পিছনে কাঠি করে। আরে বাবা, একটা আইডিয়া এসেছে। আগে

শোন, তারপর সেটাকে এগজিকিউট করবার চেষ্টা কর, তারপর তো ফেলিয়োর অ্যান্ড সাকসেস-এর কথা আসবে। একটা কথা সব সময় মনে রাখবি—ওয়ান হু ট্রাইজ অ্যান্ড ফেইলস ইজ বেটার দ্যান ওয়ান হু নেভার ট্রায়েড।"

শুভম আরও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগে পর্ণা তার মায়াবী আদুরে গলায় বলে উঠল, "আঃ গাইজ, তোরা ওর'ম কেন করছিস? আগে শুনে তো নে ঋকের আইডিয়াটা।"

অ্যানি হেসে বলল, "নাও, পর্ণা ম্যাডাম বলেছেন, অতএব সবাই চুপটি করে বসে ঋকবাবুর আইডিয়া শোনো।" তারপর পর্ণার দিকে তাকিয়ে, বসেই খানিকটা বাও ডাউন করার ভঙ্গিতে বলল, "অ্যাজ ইউ উইশ ইয়োর হাইনেস।"

পর্ণাও মুচকি হেসে বলল, "ওঃ, থ্যাংক ইউ ডার্লিং।"

কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট নম্বর ১৩/বি-তে আজ সন্ধ্যায় চার বন্ধুর আসর বসেছে। এরা চারজনই কলেজ স্টুডেন্ট, অভিজাত পরিবারের সন্তান, কলেজে পড়াশোনার সূত্রে বাড়ির থেকে দূরে, অন্য শহরে কলেজের কাছে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে এই চারজন। পড়াশোনা ছাড়াও এই চারজন বন্ধু মিলে একটি ইউটিউব চ্যানেল ও চালায়, চ্যানেলের নাম 'ক্রসওয়ার্ল্ড ক্রিপ্স'। এই চ্যানেলে বিভিন্ন ভৌতিক, প্যারানর্মাল, সুপারন্যাচারাল স্থান, বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয় নিয়েই খালি ভ্লগ বানানো হয়।

সম্প্রতি তাদের চ্যানেলের এক লাখ সাবস্ক্রাইবার পূরণ হয়েছে, সিলভার প্লে বাটনও পেয়েছে ওদের চ্যানেল। আজকে তারই সেলিব্রেশন পার্টি চলছে, তা ছাড়া আজকে ভ্যালেন্টাইন'স ডে বলেও কথা। এই দু-জোড়া কাপ্ল আবার লিভ ইন রিলেশনশিপে আছে। অ্যানি আর শুভমের ফ্ল্যাটে আজকের পার্টিটা হচ্ছে। ঋক আর পর্ণা এই হাউসিং কমপ্লেক্সেই আরও দুটো বিল্ডিং পরে থাকে। অ্যানিদের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ো, থ্রি বিএইচকে। তারই একটা রুমে ওদের স্টুডিয়ো, সেখানে সাউন্ড রেকর্ডিং, এডিটিং অ্যান্ড ডাবিং-এর কাজ করে ওরা। তবে ভবিষ্যতে একটা বড়ো স্টুডিয়ো করার চিন্তাভাবনাও তাদের আছে।

সবাই এবার ঋকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল। শুভম বলল, "দেখ ঋক, আগের দুটো ভ্লগই ফ্লপ, এই এক মাসে 'টেন কে' ভিউজও পার করেনি। এরকম চলতে

থাকলে ভালো অ্যাডস কী করে পাব বল!"

ঋক আত্মবিশ্বাসী গলায় শুভমের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, "আরে ব্রো, সেইজন্যই তো আজকে এই মিটিংটা তোদের ফ্ল্যাটে রেখেছি। আজকে ভ্যালেন্টাইন'স ডে, সেটা খেয়াল আছে? নেক্সট প্রোজেক্টটা নিয়ে যদি সিরিয়াস না হতাম, তাহলে আমি আর পর্ণা এতক্ষণে মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখে রেস্টুরেন্টে রোমান্টিক ডিনার করতে বেরিয়ে যেতেই তো পারতাম।"

ভ্যালেন্টাইন'স ডে-র কথাটায় অ্যানি আর শুভমের মধ্যেও একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। পর্ণা ফোন করে আসার কথাটা না বললে, ওদের দুজনের সন্ধ্যার প্ল্যানটাও খানিকটা এরকমই ছিল।

ঋক বলতে শুরু করল, "ব্লাডি মেরি চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তোরা কে কে জানিস? এককথাতেই সবাই হাত তুলে দিল। বস্তুত আজকের দিনে ইয়াং জেনারেশনের প্রায় সবাই ব্লাডি মেরি সম্পর্কে জানে।"

অ্যানি প্রথমে বলল, "ব্লাডি মেরি ইংল্যান্ডের মধ্যযুগীয় একটা লোককথা বা কিংবদন্তিও বলা যায়, যেটা গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ডের রানি প্রথম মেরি বা মেরি টিউডরকে কেন্দ্র করে। অনেকে অবশ্য এ-ও বলেন, লোককথায় উল্লিখিত এই মেরি আসলে এলিজাবেথ ব্যাথরি নামের এক ক্রূর রানিও হতে পারে।"

"ভেরি গুড, কিন্তু আমি যতদূর জানি—ইংল্যান্ডের রানি প্রথম মেরিকেই বেশির ভাগ লোকে ব্লাডি মেরি বলত। তার কাহিনিও খুব দুঃখের। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি আর ক্যাথরিন অব অ্যারাগনের তৃতীয় কি চতুর্থ সন্তান ছিল মেরি। ১৫১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মেরি জন্মগ্রহণ করে, তার আগে তার বাবা-মায়ের যে ক-টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, তারা সব মারা যায়, কেবল মেরি বেঁচে যায়। যদিও তার বাবা হেনরি তাকে নিয়ে খুব একটা বেশি উৎফুল্ল ছিলেন না, কারণ তিনি বরাবর একটি পুত্রসন্তান চেয়েছিলেন, যে তার সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে। মেরির যখন প্রায় তেরো বছর বয়স তখন তার বাবা তার মায়ের থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চান এই মর্মে যে, ক্যাথরিন আগে তার দাদা আর্থারের স্ত্রী ছিল...।"

এইখানে অ্যানি হঠাৎ ঋককে থামিয়ে ব্যঙ্গাত্মক স্বরে প্রশ্ন করে, "তা এই কথাটি কি রাজামশাই ক্যাথরিনকে বিয়ে করবার সময় জানতেন না? হঠাৎ তেরো